The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

আবূ নুওয়াসের কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধ

[Islamic Values in the Poetry of Abu Nuwas]

Rumana Ferdousi
PhD Fellow, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 30 January 2025
Received in revised: 23 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
The Islamic awareness of Abu Nuwas, His praise for Islamic values and piety, The value of forgiveness and tolerance in Islam, Justice in Islam, The necessity of generosity and magnanimity, Others commendable qualities.

ABSTRACT

Abu Nuwas, a classical Abbasid-era poet, is often associated with themes of hedonism and satire. However, beneath his provocative verses lies a complex engagement with Islamic values. This study explores the religious dimensions in his poetry, highlighting themes of repentance, divine justice, and Sufi mysticism. Despite his reputation for indulgence, Abu Nuwas also composed poems reflecting sincere spiritual reflection and adherence to Islamic moral principles. By analyzing his works through a religious lens, this paper reevaluates his poetic legacy, demonstrating how Islamic ethics and spirituality influenced his literary expressions.

ভূমিকা

সাহিত্য অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা বিনিময়ের একটি অন্যতম মাধ্যম। কবি-সাহিত্যিকদের সৃজনশীল কর্মে তাদের বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার বর্ণনা থাকে, যা পাঠক ও শ্রোতাদের মানসিক দক্ষতা এবং চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সাহিত্য পাঠকদের অনুভূতিকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। মানব সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার বের করে তদস্থলে মূল্যবোধগুলোর বীজ বপন করে। যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিকগণ সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে মানুষের মাঝে মূল্যবোধ জাগ্রত করতে অনবদ্য প্রয়াস চালিয়েছেন। কবিতা সাহিত্যের অন্যতম শাখা, যা মানুষের আত্মার গভীরে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। কবিতা মানুষের অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা এবং কাজকেও প্রভাবিত করে। বিশেষ করে যদি এই কবিতাটি কোনও মহিমান্বিত কবির কাছ থেকে আসে। আব্বাসীয় যুগের কবিদের মাঝে আবূ নুওয়াস অন্যতম একজন কবি। এ কবির জীবন-যাপন নিয়ে সুখকর কথা শোনা যায় না। নেতিবাচক কথন ও আচরণের জন্য তার খ্যাতি রয়েছে। কিন্তু তার কবিতার ভেতরে প্রবেশ করলে শ্রুত কথাসমূহ যথাযথ মনে হবে না; বরং তাকে একজন অভিক্ষ দার্শনিক ও সমাজ চিন্তক হিসেবে আবিষ্কার করা দুষ্কর নয়। তার কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি শৈল্পিক ও বস্তুনিষ্ঠ গঠনও তার কবিতায় লক্ষণীয়। উল্লেখ্য যে, আবু নুওয়াসের কবিতায় দুই ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে; ১. বিশুদ্ধ ইসলামী মূল্যবোধ। ২. সাধারণ আরব মূল্যবোধ, যা ইসলাম আসার আগে আরবদের মধ্যে বিদ্যমান মূল্যবোধ। ইসলাম আসার আগে প্রচলিত কোন ভাল কাজকে ইসলাম বাদ দেয়নি; বরং সেগুলোকে আরো মজবুত করেছে। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবূ নুওয়াসের মূল্যবোধ আলোকপাত করা হলো।

আবূ নুওয়াসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অশ্লীল কবিতার জন্য আরব কিংবা অনারব সবার কাছেই সমানভাবে পরিচিত কবি আবূ নুওয়াস। কবি আবূ নুওয়াসের প্রকৃত নাম আবু আলী হাসান ইবনে হানী আল হাকামী। কবির ঘনিষ্ট ব্যক্তি খালফ আল আহমার কবিকে ইয়েমেনের রাজবংশ যূ নুওয়াসের নামানুসারে আবূ নুওয়াস নামকরণ করেন।[1] আব্বাসীয় যুগে ইরাকের আহওয়ায নামক পল্লীতে হিজরী ১৪৫ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন আরব, মা পারস্যের। তাঁর পিতা দামেস্কর অধিবাসী ছিলেন। খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সেনাবাহিনীতে চাকুরীকালে তিনি আহওয়াযে বদলী হন। এখানে তিনি যনবান নামী এক নরীর প্রেমে পড়েন ও তাঁর সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হন। এ নারীর গর্ভেই কবি ও তাঁর ভাই জন্মগ্রহণ করেন। কবি আহওয়াযে জন্ম গ্রহণ করলেও বসরায় লালিত পালিত হন। আত্মীয়-স্বজন কারো মধ্যেই কাব্যচর্চার বাতিক ছিল না। কাব্য ছিল তার সহজাত পতিভার একটি। জন্মের সময়ে বাবা মারা যান। মা আরেকটি বিয়ে করে তাকে রেখে আসেন বসরায়। সেখানে তিনি কুরআন নিয়ে পড়াশুনা করেন। পুরো কুরআনের হাফিজ হন। তার পরবর্তী জীবনে কুরআনের শিক্ষার খুব বেশি পতিফলন দেখা না গেলেও বলা যায় জীবনের শেষটা হয়তো এ কুরআন দিয়েই রচিত হয়েছিল। শেষের কবিতা রচনায় এক বড়ো পভাব ছিল আল্লাহর এই কালাম। আতর ব্যবসার মাধ্যমে তিনি তাঁর কর্ম জীবন শুরু করেন। কিন্তু আতর তৈরীর চাইতে কাব্য বাণী তৈরীর দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিলো বেশী। তাই সময় পেলেই কবিদের সাহচর্য পেতে জলসায় উপস্থিত হতেন।

আবূ নুওয়াসের জ্ঞানসাধনা

শৈশবে পিতৃহীন হয়ে আবূ নুওয়াস পতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবন যুদ্ধে বিজয়ী হন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এই বালকটি একদা মাতুলালয়ে অশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে জীবন ধারণ কল্পে আতর বিক্রেতার চাকুরী নেয়। এ সময় তিনি উপলব্ধি করেন, এ চাকুরী তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় এবং পতিভা বিকাশের পথে সহায়কও নয়। সুতরাং তিনি অবসর সময়ে তৎকালে পচলিত নিয়মমাফিক মসজিদে অনুষ্ঠিত শিক্ষার মজলিসে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য আসরেও তাঁর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।[২] এ সব মজলিসে কবিতার রাভী, সীরাত ও ইতিহাস বিশারদ এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে স্ব স্ব বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন। আবূ নুওয়াস এ সব বিষয় গভীরভাবে আত্মস্থ করেন। ক্রমে তাঁর জ্ঞানের পরিমণ্ডল বিসতৃত হতে থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক সময় তিনি পুরো রাত এদের সাথে আড্ডা দিয়ে কাটাতেন। এক সময় এসব আড্ডাবাজ বন্ধুদের পভাবে তিনি মাদকাসক্ত ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়েন। এ গড্ডালিকা পবাহ তাকে বেশী দূর এগুতে দেয়নি।

খলীফা হারুনুর রশিদের দরবারে আবু নূওয়াস

পাথমিক অবস্থায় তিনি হারছামা ইবনু আম্বয়ুন এর মাধ্যমে খলীফা হারুন আল-রশীদের (৭৮৬ খ্রীঃ-৮০৯ খ্রীঃ) দরবারে স্থান লাভ করেন এবং তাঁর স্তি কাব্য রচনা করে পুরস্কৃত হন। তখন আবূ নুওয়াসের বয়স ছিলো ত্রিশ বছর। বাগদাদে কবি জ্ঞানী গুণীদের সাহচর্যে এসে অল্প দিনেই নানান বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। তাঁর সুখ্যাতি শুনে স্বয়ং খলীফা তাকে তাঁর প্রশস্তি রচনা করতে বললেন। আর এর মাধ্যমেই কবির ঠাঁই হয়ে গেল হারুনুর রশীদের দরবারে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি খলীফার অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে দাঁড়ালেন। কবি আবূ নুওয়াস আবদুল ওহাব আল-ছাক্বাফী পরিবারের জিনান নাম্নী খলীফার এক ষোড়শী বাঁদীর প্রেমে পড়েন। খলীফাও তাঁর এ প্রেমকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন।[৩]

মৃত্যু: কবি আবূ নুওয়াস **১৯৯** হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।[৪]

সাহিত্য কর্ম: আবূ নুওয়াস একজন কবি। তার রচিত কবিতা তিনি লিপিবদ্ধ করেননি, বর; তার মৃত্যুর ত্রিশ বা চল্লিশ বছর পর বিভিন্ন লেখক তা একত্রিত করে দীওয়ানু আবি নূওয়াস নামকরণ করেন। যেমন আল সূলী কর্তৃক সংকলিত দীওয়ান। তার দীওয়ানটিকে বারো অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে বারো হাজার চরণ রয়েছে।[৫]

আবূ নুওয়াসের ইসলামী চেতনা

আবূ নুওয়াস কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো কি নিছক শৈল্পিক দৃষ্টি ছিল, নাকি এগুলো বাস্তব ছিল? কবির যাপিতজীবনের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কবির জীবন অনুসন্ধান এবং তার কবিতা পড়ার পর স্পষ্ট হয় যে, যদিও কবি আবূ নুওয়াস হারাম, চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদে ডুবে ছিলেন, তবুও তিনি অন্য সাধারণ মুসলিমের মত ধর্মীয় অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকতেন। অনুতপ্ত হয়ে জান্নাত লাভের আশা করতেন এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার ইচ্ছার প্রাবল্য তার মধ্যে ছিল। উদাহরণস্বরূপ কবি বলেছেন,[৬]

انقضت شرتي فعفت الملاهي * إذ رمى الشيب مفرقي بالدواهي

ونهتني النهى فملت إلى العدل * وأشفقت مـن مقالـة نـاه

"আমার দুষ্টতা কেটে গেছে এবং আমার চিত্তবিনোদন বন্ধ হয়ে গেছে, যেমন আমার বার্ধক্য বিচ্ছেদকে নেশার সাথে নিক্ষেপ করেছে। নিষেধকারী আমাকে নিষেধ করেছিল, আমি ন্যায়ের জন্য কাজ করেছি এবং তিনি যা নিষেধ করেছিলেন আমি তা করতে ভয় করি।"

কবিতার এই লাইনগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, কবি অনুশোচনা, আত্ম-পরীক্ষা এবং সত্য উপলব্ধি করার সময় নিজের ইচ্ছার মধ্যে এক রকম অস্থিরতা অনুভব করতেন এবং যখন এই অস্থিরতা তাকে গ্রাস করত তখন তিনি উদাসীনতার মধ্যে থাকেন। তবে বাস্তবে আবু নুওয়াস তার নিজের ইচ্ছা এবং কামনা-বাসনার মুখে ধৈর্য ধরতে অক্ষম ছিলেন এবং তিনি নিজেকে স্থায়ীভাবে অপবিত্রতা ও পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারতেন না। তার অনুতাপ কয়েক ঘন্টার বেশি ছিল না। কিন্তু কবি সর্বদাই কামনা-বাসনা পূরণে ডুবে থাকতেন না। তিনি কাঁদতেন, অনুশোচনা করেতেন এবং ভয়ও পেতেন। তাই বলা যায় যে, আবু নুওয়াস আসলেই দুনিয়া বিমুখ হওয়ার একান্ত আশাবাদী ছিলেন।

ইসলামী মূল্যবোধের প্রশংসা

আব্বাসীয় কবিরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাদের কবিতায় প্রাচীন কাব্যিক পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। যেমন, প্রশংসা, ব্যঙ্গ, বিলাপ, বংশ, গর্ব বর্ণনা এবং দুনিয়া বিমুখতা ইত্যাদি। যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুগোপোযোগী পদ্ধতিতে শব্দচয়ন এবং

অর্থকে নতুন করে তুলেছিলেন। তাদের লিখনীতে সমাজচিত্র ও পারিপার্শ্বিক চরিত্রের বর্ণনার পাশাপাশি সৃজনশীল আবহও বিদ্যমান থাকতো। সেই সময় কবিতার প্রাচীন বিষয়াবলি নতুন সংস্করণে উপস্থাপিত হয়েছিল। কারণ, ইসলাম আগমনের পর প্রশংসার অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রাক-ইসলামিক যুগে মদ পান করা, জুয়া খেলা এবং লালসায় লিপ্ত হওয়া ছিল প্রশংসার বিষয়। কিন্তু ইসলাম আসার পর সেগুলো পাপাচারের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। তবে ব্যক্তি প্রশংসা প্রাচীন এবং আধুনিক সকল যুগেই বিদ্যমান ছিল। একজন ব্যক্তির উদারতা, সাহস, দয়া এবং সতীত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রশংসা করা হয়। প্রাচীন যুগে এগুলোর পাশাপাশি কিছু কামুক গুণাবলীর দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। যেমন মুখের সৌন্দর্য এবং শরীরের মহিমা। ইসলাম এবং পরবর্তী যুগে আরবী কবিতায় এই প্রবণতা অনেকটা কমে গেছে। আব্বাসীয় কবিদের প্রশংসামূলক কবিতার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো, খলিফা, মন্ত্রী, গভর্নর ও নেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাদের সন্তুষ্টি ও মূল্যবান উপঢৌকন অর্জন করা।[৭]

তাকওয়া

তাকওয়া আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ভয় করা। পরিভাষায়, আত্মাকে সুরক্ষায় রাখা, আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় অপরাধ, অন্যায় এবং আল্লাহর অপছন্দের কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার নাম তাকওয়া। মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এটিই সকল গুণের উৎস। তাকওয়া যদি একটি গাছ হয়ে থাকে তাহলে সহমর্মিতা, আনুগত্য, সততা ও ন্যায়বিচার প্রভৃতি সবই সেই গাছের ফল। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন এবং তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন। তাই কবি আবু নুওয়াস খলিফা, আমীর ও নেতাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনকারী এবং ধার্মিক হিসেবে প্রশংসা করেছেন। আর তাকওয়া অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ। আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া সম্পর্কে বলেন,[৮] ومن يتق الله يجعل له مخرجا "এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য একটি পথ তৈরি করবেন।" কবি আবূ নুওয়াস বাদশাহদেরকে তাকওয়ার অধিকারী হিসেবে প্রশংসা করেছেন। কবি হারুন অর-রশিদের প্রশংসায় বলেছেন,[৯]

تبارك من ساس الأمور بعلمه * وفضل هارونا على الخلفاء
نعيش بخير ما انطوينا على التقى * وما ساس دنيانا أبو الأمناء
إمام يخاف الله حتى كأنه * يؤمل رؤياه صباح مساء

"মহিমান্বিত সেই সত্ত্বা যিনি তার জ্ঞানের মাধ্যমে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি অন্যান্য খলিফার চেয়ে হারুনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যতক্ষণ আমরা খোদাভীতির উপর থাকি ততক্ষণ আমরা ভাল থাকি, আমাদের রাজ্য পরিচালনা করেন নিরাপত্তার অধিকারী। তিনি এমন নেতা যিনি আল্লাহকে ভয় করেন, এমনকি তিনি সকাল-সন্ধ্যায় তাকে দর্শনের আশায় থাকেন।" কবি অপর একটি কবিতায় বলেছেন,[১০]

ملك تطيب طباعه ومزاجه * عذب المذاق على فم المتذوق
يلقى جميع الأمر وهو مقسم * بين المناسك والعدو الموفق

"তিনি এমন রাজা যার স্বভাব ও মেজাজ ভালো, কথার স্বাদ গ্রহণকারীর জন্য সুমিষ্টভাষী। তিনি রাজ্য পরিচালনা এবং শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলা সবকিছু সমানভাগে ভাগ করে নিয়ন্ত্রণ করেন।"

কবি আবু নুওয়াস তাকওয়া সম্পর্কে বলেন,[১১]

من اتقى الله فذاك الذي * سيق إليه المتجر الرابح
شمر فما في الدين اغلوطة * ورح لما أنت له رائح

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার কাছে লাভবান ব্যবসা পরিচালিত হবে, তারা এমন ধর্মের পথে চলছে যাতে কোন ভুল নেই এবং ঘ্রাণযুক্ত বস্তু থেকে ঘ্রাণ নেয়।"

ক্ষমা

মহান আল্লাহর সৌন্দর্যময় সিফাতগুলোর মধ্যে একটি হলো ক্ষমা। সুন্দর-শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ ও মানব কল্যাণে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মহান আল্লাহ চান, মানুষ যেন তার গুণে গুণান্বিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখে। মহান আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল। মানুষ যদি পাহাড়সম অন্যায় করে, অনুতপ্ত হয় আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তিনি সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। মানুষও অন্যান্য সৃষ্টিকুলের প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করুক এটাও তার পছন্দ। কবি আবু নুওয়াস বাদশাহদেরকে ক্ষমাশীল বলে প্রশংসা করেছেন। যেমন এক কবিতায় বলেন,[১২]

بِعَفوِكَ بَل بِجُودِكَ عُذْتُ لا بَل * بِفَضلِكَ يا أَميرَ الْمُؤمِنينا
فَلا يَتَعَذَّرَنَّ عَلَيَّ عَفوٌ * وَسِعَتَ بِهِ جَميعَ العالمينا

"হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার ক্ষমা এবং উদারতার আশায় ফিরে এসেছি, আপনার কোন অনুগ্রহ লাভ করার জন্য নয়। আমার জন্য কোন ক্ষমা আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়, আপনি ক্ষমা দিয়ে আমাদের রাজ্যকে প্রসারিত করেছেন।"

তবে আমাদের কাছে মনে হয় যে, কবি এটিকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যা কবির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামী মূল্যবোধকে অস্বীকার করেছেন। এই কবিতাগুলোর বেশিরভাগই কারাগার থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে লিখেছেন। তার ঘন ঘন বিচ্যুতিপূর্ণ আচরণ এবং তার অশ্লীলতার ধারাবাহিকতা যা তাকে কয়েকবার কারারুদ্ধ করে রেখেছিল।

ন্যায়পরায়তা

ন্যায়পরায়ণতা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় একটি ইসলামী ও মানবিক আদর্শ। এমনকি জীবনের সমস্ত বিষয় পরিচালনায় এটিকে একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি করে তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ এই গুণকে রাসূলদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। বিচার বিভাগ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। ন্যায়পরায়ণ হওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন শাসক। শাসককে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। অনেক মুসলিম শাসকের ন্যায়বিচার ও অন্যায় প্রতিহত করার গৌরবময় ইতিহাস আছে। এই ক্ষেত্রে ওমর ইব্‌ন আবদুল আজিজের জীবনী অনুপম উদাহরণ। কিন্তু কবি আবূ নুওয়াস তার সময়ের বাদশাহদের ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা করেছে। যেমন আবু নুওয়াস হারুন আল-রশিদ এর প্রশংসা করে বলেছেন,[১৩]

لا غرو ينفرج الدجى عن وجهه * عدل السياسة، حبه إيمان

"তার মুখ থেকে অন্ধকার সরে যাবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, তিনি ন্যায় পরায়ণ রাজনীতিবিদ, তার ভালোবাসা ঈমানের অংশ।"

উদারতা

ইসলামের পূর্বে আরবদের মধ্যে উদারতা ছিল সবচেয়ে বিস্ময়কর গুণাবলীর মধ্যে একটি। এমনকি তাদের উদারতা সম্পর্কে প্রবাদ-প্রবচনও তৈরী হয়েছিল। তবে প্রাক-ইসলামী যুগে উদারতা পাপাচার এবং প্রেম সম্পর্কিত ছিল। পরবর্তীতে ইসলাম উদারতাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য খাঁটি গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় দানের প্রতি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ নিষেধ করেন না ঐ লোকদের সঙ্গে সদাচার ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের আবাসভূমি থেকে তোমাদের বের করে দেয়নি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।'[১৪] কবি আবু নুওয়াস আল-ফাদল ইব্‌ন আল-রাবির ন্যায়পরায়তার প্রশংসা করে বলেছেন,[১৫]

والله من شاء نصر * وأنت وإن خفنا الحصر

أغنيت ما أغنى المطر * وفيك أخلاقُ اليَسر

"আল্লাহর কসম, যে বিজয় চাবে সে এবং আপনি বিজয়ী হবেন, যদিও আমরা বন্দিত্বের ভয় করি। আপনি বৃষ্টির মতো সমৃদ্ধ এবং আপনার মাঝে সরল চরিত্র বিদ্যমান।"

চারিত্রিক পবিত্রতা

চারিত্রিক পবিত্রতা একটি ইসলামী মূল্যবোধ এবং একটি মানবিক চাহিদা, যা ছাড়া জীবন সুন্দর হতে পারে না। যে চারিত্রিক পবিত্রতা হারায় সে মানুষের চোখে অপদস্থ হয়। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান। চারিত্রিক পবিত্রতা লঙ্ঘন করা বীরত্বের অন্যতম ত্রুটি। কবির দৃষ্টিতে সতীত্ব হারানো একটি স্বাভাবিক বিষয়। তাই এ বিষয়ে তার লিখনীগুলো সমাজের বিরক্তির কারণ। তিনি সতীত্বকে অনৈতিকতা, বিনোদন এবং অনৈতিকতার বিপরীতে ঠেলে দিয়েছিলেন এবং এইভাবে তাঁর সমসাময়িকদের সমালোচনায় ভুগছিলেন, যা তাঁর কাব্যিক বীরত্ব, বুদ্ধি এবং উদারতা সত্ত্বেও তাঁর মূল্যকে হ্রাস করেছিল। সতীত্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি নিষিদ্ধ সীমারখা। কবি আবু নুওয়াস বাদশাহ আল-আব্বাস ইব্‌ন উবাইদ আল্লাহর প্রশংসা করে বলেছেন,[১৬]

فهو بالمالِ جواد * وهُوَ بِالعِرْضِ شَحيحُ

"তিনি অর্থের ক্ষেত্রে উদার, কিন্তু আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল।"

চারিত্রিক পবিত্রতা

চরিত্র এক অমূল্য ধন। উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতে যাবে এবং খারাপ চরিত্রের কারণে জাহান্নামে যাবে। চরিত্র মানুষের মূল পরিচয়। যার চরিত্র ভালো, সে মানুষের কাছেও ভালো আর যার চরিত্র খারাপ, সে মানুষের কাছেও খারাপ। অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করা এতই গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব জরুরি বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা রাসুল সা.-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যসমূহের মাঝে বর্ণনা করেছেন। যেমন- তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল আবির্ভূত করেছেন; যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন।' [১৭] এ সম্পর্কে কবি বলেন,[১৮]

أيا أمين الله من للنّدى * وعصمة الضَّعْفَى، وفَكِّ الأسير
خلَّفْتَنَا بَعْدَكَ نبكي على * دُنْياك والدين بدمع غزير
يا وَحْشَتَا بَعْدَك ! ماذا بنا * أحلّ من ضَنك صُروف الدهور

"হে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দানকারী! দুর্বলের আস্থা, বন্দীকে মুক্তি দানকারী, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমরা আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের কর্ম স্মরণ করে অবিরত কাঁদছি, হায়! আপনার বিদায়ের পর কী নিঃসঙ্গতা! আমাদের কী হলো, আমরা কালের পর কাল আপনার সংকীর্ণতায় ভুগছি?"

জিহাদ ও দ্বীনের হেফাজত

জিহাদ ও ধর্ম রক্ষা ইসলামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে এবং মুসলমানদের কিতাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে। নবী-সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসেও এ বিষয়ে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কারণ মহান আল্লাহ জানেন, এই পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়ের শক্তিকে মিথ্যার মুখোমুখি অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। কবি আল-আব্বাস ইব্ন উবাইদুল্লাহর জেহাদী চেতনা ও সাহসিকতার প্রশংসা করে বলেছেন,[১৯]

وإذا مَجَّ القَنـا عَلَقـا * وتـراءى المـوتُ في صُـورة
راح في ثِنْيَيْ مُفَاضَتِهِ * أسَدٌ يدْمَى شَبَا ظُفُرِه
تتأتى الطَّيرُ غُدْوَتَهُ * ثِقَة بالشبع من شبع من جزره

"যখন বর্শা রক্তপিণ্ড বের করলো আর মৃত্যু একটি ছবির মত দেখা দিলো, শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা শুরু হলো তখন একটি সিংহের নখ থেকে রক্তপাত হলো, তার হত্যাকাণ্ড দেখে পাখিরা তৃপ্তির সাথে দুপুরের খাবারের জন্য আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসে।"

দয়া ও করুণা

এটি একটি খাঁটি ইসলামী আদর্শ। এটা বলা যায় না যে, এটি ইসলামের আগে আরবে বিদ্যমান ছিল। যদিও কিছু লোক এই গুণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল, তবে এটি এমন গুণ হিসাবে বিবেচিত হতো না, যার কারণে একজন ব্যক্তিকে প্রশংসা করা যায়। প্রাক-ইসলামী যুগে মেয়েশিশু হত্যা আরবদের আত্মায় করুণার অনুপস্থিতির সর্বোত্তম প্রমাণ। আবার এক বেদুঈনের হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাতিকে চুম্বন করায় সেই বেদুঈন আশ্চর্য হয়েছিলেন। আবু নাওয়াসের কবিতায় এই করুণার কথা কিছুটা বিদ্যমান ছিল; কারণ তিনি প্রায়ই কবিদের প্রশংসা করেন। তাদের উদারতা, ধর্ম ও ন্যায়বিচারের প্রতিরক্ষা এবং ক্ষমার গুণাবলীর জন্য প্রশংসা করেন। তাঁর প্রশংসা উদ্দেশ্য ছিল বাদশাহদের করুণা প্রার্থনা এবং তার অপকর্মের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ। তিনি আবু আব্বাসের প্রশংসা করে বলেন,

أبا العباس ما ظَنّي بشكري * إذا ما كُنتَ تعفو بالذميم
وَكُنتَ أَبًا سِوى أَن لَم تَلِدني * رحيما أو أَبَرُّ مِنَ الرَّحيمِ

"হে আবুল-আব্বাস! আপনি যখন দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন তখন আপনার প্রতি আমার কোন অভিযোগ থাকে না। আপনি একজন পিতা, যদিও আপনি আমাকে জন্ম দেননি। আপনি করুণাকারী; বরং করুণাকারীর চেয়ে বেশি মহান।"[২০]

সহনশীলতা

সহনশীলতা হলো রাগান্বিত হলে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং দুর্বলতা ছাড়াই ক্ষতির মুখে ধৈর্যধারণ করা। সহনশীলতা সর্বশক্তিমান আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে একটি। সহনশীলতা তার সবচেয়ে সুন্দর নামগুলোর মধ্যে একটি। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় মহান আল্লাহ তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে নিজেকে সৃষ্টির প্রতি অতীব সহনশীল বলে উল্লেখ করেছেন। আবু নুওয়াস তার কবিতায় বাদশাহ রশিদের সহনশীলতার প্রশংসা করে বলেছেন,[২১]

نَفسي فِداؤُكَ يَومَ دابِقَ مُنعَما * لولا عَواطِفُ حِلمِهِ لَمَ أُطلق

"আমার জান আপনার জন্য উৎসর্গ হোক যেদিন আমি ধন্য হয়েছি, তার মহানুভবতা না থাকলে আমি মুক্তি পেতাম না।"

প্রতিবেশির নিরাপত্তা

ইসলামের আগে প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে এই গুণ পাওয়া যায় না। এটি মুসলিম জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। বাড়ির পাশাপাশি বসবাসকারী আত্মীয় বা অনাত্মীয় লোকজনই প্রতিবেশী। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এরাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে এবং সহযোগিতার হাত

সম্প্রসারিত করে। কাজেই এই প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা প্রয়োজন। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ককে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا﴾

“আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, সহকর্মী, পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী-দাম্ভিককে পছন্দ করেন না”।[২২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করা পাপ। এমনকি তা ঈমানহীনতার পরিচায়ক। কবি আবু নুওয়াস তার কবিতায় ইব্রাহীম ইব্ন উবায়দুল্লাহর প্রশংসায় বলেছেন,

إذا كان إبراهيم جارك لم تجد * عليك بنات الدهر من متقدم

هو المرء لا يخشى الحوادث * جاره فخذ عصمة منه لنفسك تسلم

“যদি ইবরাহীম আপনার প্রতিবেশী হয়, আপনি আপনার সামনে কোন মুসিবতের ভয় পাবেন না। তিনি এমন ব্যক্তি যার প্রতিবেশী কখনও দুর্ঘটনার ভয় করে না। তাই আপনি তার কাছ থেকে নিজের জন্য শান্তির নিরাপত্তা গ্রহণ করুন।”[২৩]

সহানুভূতি প্রদর্শন

পৃথিবীর সব মানুষ আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া আ.-এর সন্তান। এ কারণে জন্মসূত্রে সবাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। একই পিতা-মাতা থেকে জন্মগ্রহণ করে বংশপরম্পরায় মানুষ বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত হয়েছে এবং পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই সহজে আমরা একে অন্যকে চিনতে পারি।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মানুষ! আমি তোমাদের সবাইকে একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।’[২৪] সুন্দর উপমা দিয়ে রাসুল সা. বলেছেন, ‘সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত এক দেহের ন্যায়, যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত হয়।’[২৫] কবি আবু নুওয়াস তার কবিতায় তার এক বন্ধুর শোকে লিখেছেন,

فاضت دموعك ساكبة * جزعا لمصرع والبة

“তোমার চোখের অবিরাম অশ্রু উপচে পড়ছে কঠিন অসহায়ত্বের শোকে।”[২৬]

জ্ঞানের মর্যাদা

জ্ঞান ইসলামের আগে আরবে পরিচিত ছিল, কিন্তু প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে খুব কম মানুষের মাঝে ছিল। যারা আসমানী কিতাব চর্চা করতেন, তারা ছিল হাতে গোনা কয়েক জন। তাদেরকেই জ্ঞানী হিসেবে ধরা হতো।

ইসলাম ব্যাপকভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য সবাইকে উৎসাহ দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,[২৭]

﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ﴾

“তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করবে। যখন তারা স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তারা তাদেরকে সতর্ক করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?”

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছে জ্ঞানার্জনের তাকীদ। রাসূল সা. এ তাকীদের পরিপ্রেক্ষিতেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন জ্ঞানার্জনের উপর। মহানবী সা. বলেন,[২৮] طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ “জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।” কবি আবু নুওয়াস সমাজে জ্ঞান ও জ্ঞানীর স্বল্পতা সম্পর্কে আফসোস করে বলেছেন,[২৯]

وِمِنْ قَلائِدَ قَدْ قَلّدت باقِيها * من أهل فنك أجيادا وأعلاقا

صل، إذا ما رَآهُ الْقَوْمُ عامِدَهمْ * أَزاحَ ناطِقَهُمْ صَمتا وَإطْراقَا

فليس للعلم في الأقوام باقية * عاق العواقي أبا البَيداء، فانعاقا

“আর জ্ঞানের মুক্তার মালাগুলোর মধ্যে অবশিষ্টগুলো উৎকৃষ্ট শিল্পের মানুষের গলায় ঝুলন্ত আছে, আপনি প্রার্থনা করুন, লোকেরা যখন তাদের নির্ভরযোগ্য জ্ঞানীদেরকে দেখে তখন তাদের বক্তাগণ নিশ্চুপ হয়ে যায়, আবুল বাইদার সাথে মৃত্যু মুলাকাত করেছে, মানুষের মধ্যে এখন স্থায়ী জ্ঞান নেই।”

যুহদ বা দুনিয়া বিমুখতা

কবি আবু নুওয়াস বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত ছিলেন। তিনি মদ্যপানের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তার জীবনের বেশিরভাগ সময় এটি সম্পর্কে গান গেয়ে এবং মদ্যপান করে কাটিয়েছেন, বেপরোয়াভাবে তৎকালীন সমাজের সমস্ত রীতিনীতিকে লঙ্ঘন করেছিলেন। অপরদিকে আবার নিজের ইচ্ছাকে অবাধে লাগাম দিয়েছিলেন। এটা কীভাবে হতে পারে? তাই অনেকে তাকে একজন অদ্ভুত মানুষ মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, কবি বিশেষত আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন, কারণ প্রত্যেকেই অবাধ্য হয় এবং অনুতপ্ত হয়, এটি মানবিক প্রকৃতি। কিন্তু আবু নুওয়াসের এই অনুতপ্ত অবস্থা মাত্র কয়েক দিন বা এমনকি ঘন্টা স্থায়ী হতো। আবু নুওয়াসের দুনিয়া বিমুখ সম্পর্কিত কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে।

জীবনের শুরুতে আবূ নুওয়াসের কবিতায় এর মূল্য কখনই ছিল না। আমরা মনে করি যে, কবির বেশি বয়স না হওয়া পর্যন্ত সময় ও জীবনের মূল্য সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা আসেনি। তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন তার লালসা এবং আনন্দের কাছে বন্দী হয়ে। তবে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি চেয়েছেন, মুসলমানের জন্য তার সময়কে কাজে লাগাতে এবং তার সকল সময় ও কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করতে। যেমন কবি তার কবিতায় বলেন,[৩০]

والمرء ما عاش عامل نصب لا ينقضي حرصه ولا أمله

يرجو أمورا عنه مغيبة جهلا ومن دون ما رجا أجله

"একজন ব্যক্তি যে কষ্টের কাজ করেনি তার লোভ এবং আশা কখনই শেষ হবে না
সে তার কাছ থেকে লুকানো অজানা বিষয় সমূহের আশা করে, যা সে কল্পনাও করেনি।"

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা

দুআ একটি আরবি শব্দ। যার অর্থ হলো ডাকা বা প্রার্থনা করা। দুআ একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। আল্লাহ তায়ালা সাহায্য প্রার্থনাকারীকে বা মুনাজাতকারীকে অধিক ভালোবাসেন। কবি আবু নুওয়াস দুআ সম্পর্কে তার কবিতায় বলেন,[৩১]

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة * فلقد علمتُ بأن عفوك أعظم

إن كان لا يرجوك إلا محسن * فيمن يلوذ ويستجير المجرم

أدعوك ربي كما أمرت تضرعًا * فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم

مالي إليك وسيلة إلا الرضا * وجميل عفوك ثم أني مسلم

"হে আমার প্রতিপালক! যদিও আমার পাপ অনেক বড়, আমি জানি আপনার ক্ষমা আরো বড়। যদি শুধুমাত্র নেক লোকই আপনার দয়া আশা করতে পারে, তাহলে অপরাধীকে কে আশ্রয় দিবে? হে আমার রব! যেমন আপনি আমাকে যেভাবে ভীত অবস্থায় দো'আ করার আদেশ দিয়েছেন, আমি আপনাকে সেভাবেই ডাকছি, আপনি যদি আমার দু'হাত ফিরিয়ে দেন তাহলে কে আমার প্রতি করুণা করবে? আমি আপনারই সন্তুষ্টি কামনা করি, আপনার ক্ষমা উত্তম আর আমি একজন মুসলিম।" কবি অন্যত্র বলেন,[৩২]

يا نُواسـيُّ تَوَقَّـر وَتَجَمَّل وتَصَبَّر * ساءَكَ الدَهرُ بِشَيءٍ وَبِما سَرَّكَ أكثر

يا كَبِيرَ الذَنبِ عفو الله من ذَنبِكَ أَكبَرَ * أَكبَرُ الأَشياءِ عَن أَصْغَرِ عَفْوِ اللهِ أَصْغَر

لَيسَ لِلإِنسانِ إِلَّا ما قَضى اللهُ وَقَدَّر * لَيسَ لِلمخلوقِ تدبير بل الله المُدَبّر

"হে নুওয়াস! স্থির হও, সুন্দর ধৈর্যধারণ কর। যুগের আবর্তন তোমাকে যত দুঃখিত করেছে তার চেয়ে বেশি খুশি করেছে। হে মহাপাপী! আল্লাহর ক্ষমা তোমার পাপের চেয়েও বড়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জিনিসও আল্লাহর ক্ষমার থেকে ছোট।

আল্লাহ মানুষের জন্য যা ফয়সালা করেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন, তা ছাড়া মানুষের আর কিছুই নেই। প্রাণীর কোন পরিকল্পনা কার্যকর হয় না; বরং আল্লাহই একমাত্র ব্যবস্থাপক।"

সৃষ্টি জগত নিয়ে ভাবনা

চিন্তা-ভাবনা হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃত একজন মানুষের মন স্রষ্টার বিস্ময়কর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে।

কীভাবে আল্লাহ এই মহাবিশ্বকে নিখুঁতভাবে মন-উজ্জ্বল করে সৃষ্টি করেছেন। কবি আবু নুওয়াসও আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। যেমন আমরা তার কবিতায় দেখতে পাই,[৩৩]

سبحان من خلق الخلق من ضعيف مهين * بسوقه من قرار إلى قرار مكين

في الحجب شيئاً فشيئاً يحور دون العيون * حتى بدت حركات مخلوقة من سكون

"মহিমাময় তিনি যিনি মাখলুক সৃষ্টি করেছেন দুর্বল ও অপমানিত বস্তু থেকে, তাকে একটু একটু করে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চোখের আড়ালে পরিবর্তন করেন, এক পর্যায়ে স্থিরতা থেকে মাখলুকের মাঝে নড়াচড়া সৃষ্টি হয়।"

মৃত্যু-পরকাল ও শেষ বিচার

পরকাল বা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত। কবি আবু নুওয়াস এই ধ্বংসশীল পৃথিবী, পরকাল এবং আল্লাহর চিরস্থায়ী অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেন,[৩৪]

كُلّ نا عِ فَسَيُنعى * كُلُّ باكٍ فَسَيُكى
كُلُّ مَذخورٍ سيفنى * كُلُّ مَذكور سَينسى
ليسَ غير الله يبقى * مَن عَلا فَالله أعلى

"প্রত্যেক শোক প্রকাশকারী শোকাহত হবে, প্রত্যেক ক্রন্দনকারী অবশ্যই কাঁদবে, সকল সঞ্চিত ধন ভাণ্ডার শেষ হবে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকবে না, কেউ বড় হলে আল্লাহ সবচে বড়।"

পাপের জন্য অনুশোচনা

পাপের পরে অনুশোচনা অনেক বড় সৌভাগ্য। কোনো ব্যক্তি পাহাড় সমপরিমাণ পাপ করে যদি পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, এই পাপ অথবা গুনাহ নিয়ে শেষ বিচারের দিন তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়া নিয়ে ভয় করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির পাপসমূহকে মাফ করে দেন। আল্লাহ বলেন, 'বলে দাও, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর অবিচার করেছো। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না'।[৩৫] কবি আবু নুওয়াস মাঝে মাঝে নিজ কর্মের জন্য অনুশোচনা করতেন। যদিও তার অনুশোচনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতো না। কবি তার কবিতায় পাপের জন্য অনুশোচনা করে বলেন,[৩৬]

كم ليلة قدبت ألهو بها * لو دام ذاك اللهو للاهي
حرمها الله وحللتها * فكيف بالعفو من الله

"কত রাত আনন্দ করে কাটিয়েছি? যদি এই বিনোদন স্থায়ী হয়, তাহলে আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাব। আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তা আমি বৈধ মনে করেছি। সুতরাং কীভাবে আল্লাহর ক্ষমা আশা করা যায়?"

দুনিয়াবি লোভ পরিত্যাগকরণ

জীবনের শুরুতে আবূ নুওয়াসের কবিতায় এর মূল্য কখনই ছিল না। আমরা মনে করি যে, কবির বেশি বয়স না হওয়া পর্যন্ত সময় ও জীবনের মূল্য সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা আসেনি। তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন তার লালসা এবং আনন্দের কাছে বন্দী হয়ে। তবে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি চেয়েছেন, মুসলমানের জন্য তার সময়কে কাজে লাগাতে এবং তার সকল সময় ও কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করতে। যেমন কবি তার কবিতায় বলেন,[৩৭]

والمرء ما عاش عامل نصب لا ينقضي حرصه ولا أمله
يرجو أمورا عنه مغيبة جهلا ومن دون ما رجا أجله

"একজন ব্যক্তি যে কষ্টের কাজ করেনি তার লোভ এবং আশা কখনই শেষ হবে না
সে তার কাছ থেকে লুকানো অজানা বিষয় সমূহের আশা করে, যা সে কল্পনাও করেনি।"

অহংকারের নিন্দা

অহংকারকে আরবিতে বলা হয় উম্মুল আমরাজ; অর্থাৎ সকল পাপের জননী। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম পাপই হচ্ছে অহংকার। আদম আ.-কে সৃষ্টির পর তাকে সেজদা করার জন্য আল্লাহ তাআলা যখন সবাইকে আদেশ করেন, তখন ফেরেশতাগণ সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন কিন্তু ফেরেশতাদের মাঝে বেড়ে ওঠা ইবলিস অস্বীকার করে বসল। সে আগুনের তৈরি বলে অহংকার করল, ফলে তার অধঃপতন হলো। কবি তার কবিতায় সবাইকে অহংকার থেকে সতর্ক করেছেন। যেমন তিনি বলেন,[৩৮]

لا تَفْرُغُ النَّفْسُ مِن شُغلِ بِدُنياها * رَأَيْتُها لَم يَنَلَها مَن تَمَناها
إِنَّا لَنَنفُسُ فِي دُنيا مُوَلِّيَةٍ * وَنَحنُ قد نكتفي منها بأدناها
حَذَّرتُكَ الكِبَرَ لا يَعلَقكَ ميسمُهُ * فَإِنَّهُ مَلبَس نازَعَتُهُ الله

'আত্মা পৃথিবীর ব্যস্ততা থেকে শূন্য নয়, আমি দেখেছি, যে তাকে চেয়েছে কেউ পায়নি, যেহেতু আমরা পার্থিব জগতে বাস করছি, তাই আমরা সর্বনিম্ন পরিমাণই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আমি তোমাকে অহংকার থেকে সতর্ক করেছি, যেন তার সামান্য কণাও তোমাকে স্পর্শ না করে, কারণ এটা আল্লাহর মনোনীত পোশাক।'

তিরস্কার

তিরস্কার হল কবিদের দ্বারা ব্যবহৃত কাব্যিক উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি। আমরা আবূ নুওয়াসের কবিতায় এই শিল্পের কিছু প্রতিফলন খুঁজে পাই। আবু নুওয়াস স্বাভাবিকভাবেই একজন সামাজিক কবি যিনি একাকীত্ব উপভোগ করেন না। তিনি দুঃখ ও একাকীত্ব অপছন্দ করেন এবং জীবনকে আনন্দ ও চিত্তবিনোদনের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি তার বন্ধুদের প্রতি উদার ও মানবিক ছিলেন। তিনি তাদের খুশি করার জন্য কোনও সুযোগ ছাড়েননি। আবার একইভাবে তার শত্রুদেরকে তিনি যথাসম্ভব তিরস্কার করেছেন। কবি আবু নুওয়াস তার বন্ধুদেরকে তিরস্কার থেকে বাঁচাতে কবিতায় লিখেন,[৩৯]

لا أعير الدهر سمعي * ليعيبوالي حبيبا
لا ، ولا أذْخَرُ عندي * للأخِلاءِ العُيوبا
فإذا ما كان كون * قمتُ بالغيب خطيبا
أحفظ الإخوان كيما * يحفظوا مني المغيب

"আমি আমার বন্ধুদের নিন্দা শোনার জন্য অন্যের কাছে আমার কান ধার দেব না। না, না, আমি আমার বন্ধুদের দোষ নিজের কাছে পুষে রাখি না। সুতরাং যদি কোন দোষ প্রকাশ পায় আমি তা অদৃশ্যে প্রচার করি, আমি বন্ধুদের দোষ গোপন করি, যেন তারা আমার দোষ গোপন করে।"

ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব

মু'মিন-মুসলিমগণ সবাই পরস্পর ভাই-ভাই। তাদের মধ্যে প্রধানতম সম্পর্ক হল ঈমানী-ভ্রাতৃত্বের। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. একান্তভাবেই মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দু'পক্ষের ভাইদের মধ্যে সমঝোতা করে দাও এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়"।[৪০] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ যখন মদিনায় গেলেন এবং আনসাররা তাদের গ্রহণ করলেন তখন রাসূল সা. তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরী করলেন। এটাই ছিল মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রধান স্তম্ভ। কবি আবু নুওয়াস বিশ্বাসঘাতক বন্ধুদের আচরণে আফসোস করে বলেন,[৪১]

أرى الإخوان في هجر أقاموا * وخان الخل، وافتقد الذمامُ

"আমি হিজরে অবস্থানকারী আমার বন্ধুদেরকে দেখি যারা বন্ধুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়ে গেছে।"

কৃপণতার নিন্দা

কৃপণতা একটি মন্দ স্বভাব। এটি মানুষের অভাব আরো বাড়িয়ে দেয়। ইসলাম কৃপণতার নিন্দা করেছে। কৃপণতা সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় আর কৃপণ হতে উৎসাহ যোগায়। অপরদিকে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[৪২] রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'হে বনু সালামা! তোমাদের নেতা কে?' আমরা বললাম, 'জুদ্দ ইবনে কায়েস। অবশ্য আমরা তাকে কৃপণ বলি।' তিনি বলেন, 'কৃপণতার চেয়ে মারাত্মক রোগ আর কী হতে পারে?'[৪৩] কবি আবু নুওয়াস কৃপণতার নিন্দা করে বলেন,[৪৪]

وأكف قوم ليس يُنبط ماءَها إلا المساحي

ما شئت من مال حمى يأوي إلى عرض مباح

"সবচেয়ে কৃপণ মানুষ মাটি খুড়েও পানি বের করে না, বৈধ প্রয়োজনেও সংরক্ষিত মূল্যবান অর্থ ব্যবহার করতে চায় না।"

উপসংহার

পরিশেষে আমরা দেখতে পাই, কবি আবূ নুওয়াসের চরিত্রটি একটি বিরল চরিত্র। তার চরিত্রের মতো একটি চরিত্র দেখা সহজ বিষয় নয়। তিনি একদিকে অনৈতিকতা, অশ্লীলতা এবং অনৈতিকতার নোংরামিতে কলঙ্কিত এবং অপরদিকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত। তার জীবনের পুরো দিক অধ্যয়ন করার পরে এবং তার কবিতা পড়ার পরে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদিও কবি আবূ নুওয়াসের আত্মা নিষিদ্ধ এবং হারাম বিষয়ের মাঝে চিত্তবিনোদন, মজা এবং আমোদ-প্রমোদে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তবুও তিনি অন্য সাধারণ মুসলিম ব্যক্তির মতো ধর্মীয়ভাবে তার অবস্থার উন্নতি করতে চাইতেন এবং অনুতপ্ত হয়ে জান্নাত লাভের আশা করতেন এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা তার মধ্যে ছিল।

তথ্যনির্দেশ

[১] আহমদ হাসান আল যায়্যাত, *তারীখুল আদাব আরাবী*(বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, সংস্করণ ৬, ২০০০), পৃ.১৯৮।
[২] যায়দান, জুরজী, *তারীখু আদাবিল লুঘাত আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড* (বৈরুত : মাকতাবা আল-হায়াত, ১৯৫৮), পৃ. ২৭২।
[৩] আহমদ হাসান যায়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।
[৪] আবূ নুওয়াসের মৃত্যু সাল নিয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে তার মৃত্যু সাল ১৯৫ হিঃ (*কাশফ-আল-যুনূন আন-আসামী আল-কুতুব ওয়া আল-ফুনূন*', ১ম খণ্ড, (বৈরুত: মাকতাবাতুল মুছান্না, ১৯৪১), পৃ. ৭৭৪; ইবনু নদীম তার মৃত্যু সাল ২০০ হিঃ উল্লেখ করলেও তিনি ইবনু কুতাইবার সাথে ঐক্যমত পোষণ পূর্বক ১৯৯ হিঃ কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইবনু নদীম, *আল-ফিহরিস্ত*(বৈরুত: মাকতাবাতু খায়্যাত, ১৮৭২)।
[৫] মুকাররামা, আবূ নুওয়াস ও খাসাইসু শি'রিহী আনিল হুব্বি, দিরাসাহ, জামিআ আলাউদ্দীন আল ইসলামিয়া আল হুকুমিয়্যাহ, মুকাসির, ২০১৯, পৃ.১১০।
[৬] আল-হাসান ইব্নু হানী, *দীওয়ানু আবী নুওয়াস*, তাহকীক: আহমাদ আব্দুল মাজীদ আল-গাজালী (বৈরূত: দারুর কিতাব আল-আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৪৬৫।
[৭] মুহাম্মাদ মুস্তফা হাদ্দারাহ, *ইত্তিজাহাতুশ শি'রিল আরাবী* (বৈরূত: দারুল উলূম আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ), পৃ. ৩৯৫।
[৮] আল-কুরআন, *সূরা তালাক:* ২।
[৯] আবূ নুওয়াস, *দীওয়ান*, পৃ. ৩০৭।
[১০] *দীওয়ান*, পৃ. ৩০৬।
[১১] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৬৩।
[১২] *দীওয়ান*, পৃ. ৩০৮।
[১৩] *দীওয়ান*, পৃ. ৩০৯।
[১৪] আল-কুরআন, *সুরা আল মুমতাহিনা*-৮।
[১৫] *দীওয়ান*, পৃ. ৩৩৬।
[১৬] *দীওয়ান*, পৃ. ৩৩০।
[১৭] আল-কুরআন, *সূরা জুমা* : ২।
[১৮] *দীওয়ান*, পৃ-৩৩৮, ৪৩৭।
[১৯] *দীওয়ান*, পৃ. ৩২৭।
[২০] *দীওয়ান*, পৃ. ৩৪৭।
[২১] *দীওয়ান*, পৃ. ৩০৫।
[২২] আল-কুরআন, *সূরা নিসা*: ৩৬।
[২৩] *দীওয়ান*, পৃ. ৩৬৮।
[২৪] আল-কুরআন, *সুরা হুজুরাত*: ১৩।
[২৫] আবূ আব্দুল্লাহ মহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী : ৬০১১।*
[২৬] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৩৫।
[২৭] আল-কুরআন, *সূরা তওবা*: ১২২।
[২৮] শায়েখ ওয়ালি উল্লাহ, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কিতাবুল ইল্ম, হাদীছ: ২১৮।
[২৯] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৩২।
[৩০] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৬১।
[৩১] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৬৪।
[৩২] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৬৫।
[৩৩] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৬৪।
[৩৪] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৬২।
[৩৫] আল-কুরআন, *সূরা যুমার*: ৫৩।
[৩৬] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৬৭।
[৩৭] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৬১।
[৩৮] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।
[৩৯] *দীওয়ান*, পৃ. ২৯৮।
[৪০] আল-কুরআন, *আল-হুজুরাত*-১০।
[৪১] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৫১।
[৪২] আল *বাকারা*- ২৬৯।
[৪৩] মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-*আদাবুল মুফরাদ*, তাখরীজ: ড. সেলিম আলওয়ান (বৈরূত: শারিকাতু দারিল মাশারি'ই, ২০২১), হাদীস : ২৯৬।
[৪৪] *দীওয়ান*, পৃ. ৪৫০-৪৫১।